

উৎসকথা : প্রসঙ্গ যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’

বিকাশ মান্ডী

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/16_Bikash-Mandi.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো গোয়েন্দা কাহিনি শাখাটিও তার বর্গহীন অতীতকে পিছনে ফেলে সাহিত্যের দরবারে নিজের স্থান করে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য শাখায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরাও এই শাখায় কলম ধরেছেন। প্রসঙ্গাত, যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্যিক হিসেবেই বহুল পরিচিত। তিনি শান্ত, সহজ, সরল, সজীব। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও জীবনপ্রবাহ একই ধারায় প্রবহমান। তিনি মূলত কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ রচনার ভাবনা, রচনার উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, তাঁর সম্পাদিত ‘শুকতারা’ পত্রিকায় ইংরেজি সাহিত্যিক এনিড ব্লিটনের কথা এসেছে। মূলত যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির সৃষ্টিকথা বা উৎসকথা আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ‘শুকতারা’, এনিড ব্লিটন, যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি, পাণ্ডব গোয়েন্দা, উৎসকথা, রচনা বৃত্তান্ত

যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ৯ মার্চ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ রবিবারে। পিতা জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা নন্দরানি দেবী। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার রামনার কাছে নাড়ুগ্রাম হলেও জন্মগ্রহণ করেন হাওড়া জেলার খুঁট যষ্ঠীতলায়। এই হাওড়াতেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার সূচনা কিশোর বয়সেই ‘দৈনিক বসুমতী’ পত্রিকায় ছটোদের বিভাগ ‘ডাকঘর’এ লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও একাধিক পত্রিকায় তিনি লিখেছেন ছপত্রিকার ‘টোদের বিভাগে’। ‘শারদীয়া বসুমতী’, ‘জনসেবক’, ‘যুগান্তর’, ‘শুকতারা’, ‘শুভতারার’, ‘আনন্দবাজার’ রবিবাসরীয় আলোচনী’, ‘আনন্দমেলা’, ‘দেশ’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাহিত্যিক তারাজঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। রমাপদ চৌধুরী, সাগরময় ঘোষ, অবধূত, বিমল মিত্র, সুনীল বসু প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত তাঁর যোগাযোগ ছিল। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’এর অন্যতম কর্ণধার এবং ‘শুকতারা’ ও ‘নবকল্লোলে’র সম্পাদক ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য তাঁর জীবনপথকে করে তুলেছিল সুগম। তাঁদের আশীর্বাদ ছিল সবসময়ই তাঁর উপর। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনা একই রেখায় বয়েছিল। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও জীবনকে আমরা আলাদা করতে পারি না, জীবনের সমান্তরালেই চলেছিল তাঁর নিরন্তর সাহিত্য সাধনা। জীবনের প্রতি তাঁর ছিলনা কোনো অভিযোগ। তিনি শান্ত, সজীব, সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ জীবনের শেষ প্রহর অবধি সাহিত্য সাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনে নানান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। রাজস্থানের প্রবাদপ্রতিম কবির নামাজিকত চন্দ্র বরদাই পুরস্কার, শৈলজানন্দ পুরস্কার, সত্যজিৎ সম্মান, গজেন মিত্র ও সুমথ ঘোষ (মিত্র ও ঘোষ) পুরস্কার, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, উমাপ্রসাদ স্মৃতি পুরস্কার এবং ২০১৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি প্রদত্ত ‘বাল সাহিত্য পুরস্কারে’ ভূষিত হন। এহেন একজন সুপরিচিত সাহিত্যিকের জীবনাবসান হয় ৩ মার্চ ২০২৩ সালে। জীবনাবসানকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

কর্মজীবনে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কর্ডনিং ভিজিলেন্স সেলের একজন কর্মচারী। পিতার দৌলতে তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেছেন কিশোর বয়সেই। ভ্রমণ হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের একটি পছন্দের দিক। কৃত্রিম পর্দাবিহীন তাঁর জীবন গভীর এবং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। তাঁর জীবন নিরন্তর প্রবহমান নদীর মতো সজীব, শান্ত, স্নিগ্ধ। তাই তাঁর রচনাগুলিতেও এসেছে সজীবতা, সহজতা, সরলতা, সাবলীলতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্য সম্ভারকে চারটি মূল ধারায় ভাগ করা যেতে পারে — শিশু সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য, আধ্যাত্মিক লেখালেখি, বড়োদের উপন্যাস। মূলত শিশু সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যে তাঁর পরিচিতি। বাংলা কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। তাঁর লেখালেখি ছোটোদের জন্যই। তিনি মূলত রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনি, ভৌতিক গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেছেন। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনি, ভৌতিক গল্প, ভ্রমণ কাহিনি লিখলেও সাহিত্য জগতে পরিচিতি লাভ করেন কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি রচনায়। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি পাঠকালে পাঠক ভিন্ন রকমের এক আনন্দ অনুভব করেন। কিশোর কিশোরীদের নিয়ে রচিত তাঁর কিশোরমনস্ক গোয়েন্দা কাহিনি ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’। ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ তাঁর অন্যতম কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি। পনেরো বছর বয়স থেকে তাঁর লেখক জীবনের শুরু হলেও ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ লেখার পরিকল্পনা মাথায় আসে চব্বিশ বছর বয়সে, ১৯৬৫ সালে।

লেখকের ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ রচনার একটি বড়ো প্রেরণা ছিল তাঁর প্রিয় কুকুর পঞ্চু। এই কুকুরটিকে তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভূমি বর্ধমান জেলার রামনার কাছে নাড়ুগ্রাম থেকে এনেছিলেন হাওড়ার বাসস্থানে। তখন তাঁর পরিবার হাওড়ার ৬১নং গোপাল ব্যানার্জী লেনে ভাড়া থাকতেন। ওই সময় তাঁর বন্ধু সম্পর্ক গড়ে ওঠে দশ বারো জন প্রতিবেশী ছেলেমেয়ের সঙ্গে। বন্ধুর দল যদিকে যেতো পঞ্চুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেই যেতো। তারা দল বেঁধে রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়াত। রীতিমতো তারা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ত। ফলত পঞ্চুর সঙ্গে লেখকের দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চুর সঙ্গে সম্পর্ককে লেখক জন্মান্তর বলে মনে করতেন। ‘শুকতারা’তে লেখালেখিকালীন ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারকে বহুবার পঞ্চুর কীর্তিকলাপের গল্প বলেছেন।

সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কর্ডনিং ভিজিলেন্স সেলের কর্মচারী থাকাকালীন তিনি টিফিনের সময় একা একাই ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। মেট্রো সিনেমার দেওয়ালে সাঁটানো বিভিন্ন ছবি দেখতেন। এর পাশাপাশি তিনি বইয়ের দোকানগুলোয় ইংরেজি বই ও সিনেমা পত্রিকার সমারোহ দেখে মন ভরাতেন। এই সময়ই একদিন একটি চওড়া মলাটের বই তাঁর নজরে আসে। যেটাতে একজন দুষ্কৃতিকে কুকুর সমেত কয়েকটি ছেলেমেয়ে তাড়া করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন —

“বইটি নাড়াচাড়া করে রেখে দিলাম। বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি। ইংরেজি পড়ার অভ্যাস নেই, বুঝিও না। ভাবলাম এইরকম একটা টিম ওয়ার্ক করে লিখলে কেমন হয়?”

তিনি ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন না তাই বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে বুঝতে পারেন বইটিতে একটি টিম ওয়ার্ক আছে। কিন্তু তিনি গোয়েন্দা কাহিনি লেখার কথা ভাবলেও লেখেননি। টিম ওয়ার্ক করে লেখার আরো কারণ ছিল। ১৯৬২ সাল নাগাদ চিন-ভারত যুদ্ধ হেতু ‘আনন্দবাজার’এর ‘রবিবাসরীয় আলোচনী’তে লেখালেখি বন্ধ হওয়ায় ‘শুকতারা’ পত্রিকায় ছোটোদের জন্য নানা ধরনের লেখা তিনি লিখছেন। তাঁর সেই সময়ের সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হতো ক্রমাগত। ‘শুকতারা’ থেকে কোনো লেখাই তাঁর ফেরৎ আসত না, তিনি যা পাঠাতেন তাই ছাপা হতো। ফলে তিনি সম্পাদক ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের সুনজরে আসেন। তাঁর লেখা সাবলীল হওয়ায় প্রতিটি লেখাই তিনি ছেপে দিতেন। তিনি একবার লেখককে বলেছিলেন —

“... আমার ওপর অনেক লেখকের রাগ আছে। তার কারণ আমি সবার লেখা ছাপি না। তিন চারটে লেখা ফেরত দিয়ে তবেই একটা লেখা ছাপি। অথচ তোমার লেখা হাতে পেলে আমি সব লেখাই ছেপে দিই।”

ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার অত্যন্ত রাশভারি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়কে খুব স্নেহ করতেন। তিনি লেখককে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন লেখা দিতে কারণ প্রতি একমাস অন্তর তাঁর লেখা ছাপা হবে ‘শুকতারা’য়। ক্ষীরোদবাবুর মতে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা খুব সাবলীল, কিন্তু তিনি কখনো ভূতের গল্প কখনো হাসির গল্প, কখনো বা সাধারণ মানের গল্প লিখে থাকেন, যার ফলে তিনি কোনো এক ধরনের লেখাতে স্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না। তাই তিনি তাঁকে গোয়েন্দা কাহিনি লেখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেছিলেন —

“... তোমার লেখা খুব সাবলীল। তবে দোষ হচ্ছে কখনও তুমি একরকম লেখা লেখো না। কখনও ভূতের গল্প, কখনও হাসির গল্প, কখনও বা সাধারণ মানের গল্প, কখনও রূপকথা। এভাবে লিখলে তুমি স্ট্যাণ্ড করবে কী করে? এবার থেকে তুমি গোয়েন্দা কাহিনি লেখো।”^৩

ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের এহেন উৎসাহেই ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ছটোদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লেখার সাহস করেন। কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনি কীভাবে লিখবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না। ওসবের তো তিনি কিছুই জানেন না। সেই সময়েই হঠাৎ মনে পড়ল সেই ইংরেজি চওড়া মলাট বইয়ের কথা। যেখানে একজন দুষ্কৃতিকে কুকুর সমেত কয়েকটি ছেলেমেয়ে তাড়া করেছে। তিনি আইডিয়া পেয়ে গেলেন। তাঁর পঞ্চুকে নিয়ে এমনি এক টিম ওয়ার্ক লেখা শুরু করবেন বলে মনস্থির করলেও লেখা শুরু করলেন না। ফলত ক্ষীরোদবাবু লেখককে বলেন — “তোমাকে এত করে বলেছি গোয়েন্দা গল্প লিখতে, তুমি লিখছ না। লিখলে কিন্তু তুমি পারবে। তোমার ওই পঞ্চুকে নিয়েই টিম ওয়ার্ক তৈরি করে শুরু করো না গোয়েন্দাগিরি।”^৪

গোয়েন্দা কাহিনি লেখার উৎসাহ দিতে তিনি লেখককে ইংরেজি সাহিত্যিক এনিড ব্লিটন এর দু-একটি বই দেখালেন। এবং বললেন বিদেশে এই ধরনের গোয়েন্দা কাহিনি অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখক ইংরেজি পড়তে জানতেন না, কিন্তু বুঝতে পারলেন এই বইতেও একটি টিম ওয়ার্ক কাজ করেছে। লেখক এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন —

“... ক্ষীরোদবাবু বললেন, “গোয়েন্দা লেখা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, ধরো তোমরা ওই ছেলেমেয়ের দল গার্ডেনে যাচ্ছ ঘূর্ণিবিচি কুড়োতে, হঠাৎ পথে কোনও দুষ্ট লোক তোমাদের একটি মেয়ের গলা থেকে হার ছিনতাই করে পালাল।... কিন্তু কেউ ধরতে পারল না তাকে। এই সময় তোমাদের পঞ্চু গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ধরা পড়ল লোকটি। তারপর যা হয়, থানা-পুলিশ। পারবে না এভাবে লিখতে?”^৫

ছোটোদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদবাবু লেখককে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে তিনি লেখেন পাণ্ডব গোয়েন্দার গল্প। লেখা শেষ হলে নাম দেন ‘পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান’। কিন্তু এই নামটি মনোমতো না হওয়ায় নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’। কারণ ‘পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান’ নাম দিলে পৌরাণিক কাহিনি ভেবে কেউ যদি না পড়েন তাই এই নামকরণের পরিবর্তন। ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ কাহিনিতে পঞ্চু হয়ে উঠল হিরো, লেখক নিজেকে বাবলুর পর্যায়ে রাখলেন আর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও স্থান পেল।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় সেইসময় তারাজঙ্করের টালা পার্কের বাড়িতে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তারাজঙ্কর পুত্র সনৎকুমার পিতার লেখা ‘শতাব্দীর মৃত্যু’ নবকল্লোলকের জন্য ষষ্ঠীপদের হাত দিয়ে পাঠান। ষষ্ঠীপদ লেখাটি সযত্নে নিয়ে নিজের লেখা ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ লেখার ওপর বুলিয়ে নেন। পরদিন ‘শুকতারা’ অফিসে গিয়ে দুটি লেখায় ক্ষীরোদচন্দ্রকে দিয়ে আসেন। ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ ‘শুকতারা’ পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ জনপ্রিয়তা আসতে লাগল। তিনি ‘শুকতারা’ পত্রিকাতে ছোটোদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লেখা শুরু করেন।

‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ রচনার পটভূমিতে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ‘শুকতারা’র সম্পাদক ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে নিরন্তর উৎসাহ পেয়েছেন। তাঁর দেওয়া এনিড ব্লিটনের ইংরেজি বই পড়তে না পারলেও টিম ওয়ার্কের আইডিয়াটি গ্রহণ করেন। কাহিনির ঘটনা, পরিবেশ লেখকের নিজস্ব। লেখকের অত্যন্ত প্রিয় পঞ্চু

কাহিনির মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় লেখক তাই অভিনবত্ব দেখিয়েছেন প্লটে, অপরাধজনিত বৈচিত্রে, চরিত্র নির্মাণে, কাহিনির স্বতন্ত্রতায়। কাহিনিতে অ্যাডভেঞ্চারধর্মিতা ও ভ্রমণ সাহিত্যের উপাদান পরিলক্ষিত। ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ তাঁর অন্যতম কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি। এটি তিনি ধারাবাহিকভাবে সিরিজ আকারে লিখেছেন। তিনি গোয়েন্দা কাহিনি সিরিজটি ৩০টি খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ সিরিজে মোট ৪১টি অভিযান রয়েছে। এই ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ সিরিজটি বলা যায় কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখকের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি।

তথ্যসূত্র:

১. ‘প্রসঙ্গ : পাণ্ডব গোয়েন্দা’, যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ‘কোরক সাহিত্য পত্রিকা’ (বাংলা গোয়েন্দা সংখ্যা) প্রাক্ শারদ ১৪২০, পৃ. ২৪৯
২. ওই, পৃ. ২৪৯
৩. ওই, পৃ. ২৪৯
৪. ওই, পৃ. ২৫১
৫. ‘সাক্ষাৎকার: যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়’, জয় সেনগুপ্ত, বইয়ের দেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, ১৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এবিপি গ্রাঃ লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ১, পৃ. ১৮৯

লেখক পরিচিতি: বিকাশ মান্ডী, বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বৃত্তিভোগী পিএইচ.ডি গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ।